মোস্তাকের কথা

মোহাম্মদ মাশরুকুল হক

ইদানীং মোস্তাকের কথা খুব মনে পড়ে। অবসর সময়ের চিন্তাগুলি অনেকটাই মোস্তাক কে ঘিরে থাকে ।

ইচ্ছে হয় মোস্তাক কে নিয়ে কিছু লিখি। কিন্তু লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে মোস্তাক কে নিয়ে লিখার মত যথেষ্ট তথ্য আমার কাছে নেই । ওর অনেক কিছুই আমার অজানা ।

আমাদের সাত ভাই দু বোনের মধ্যে মোস্তাক ছিল চতুর্থ ।

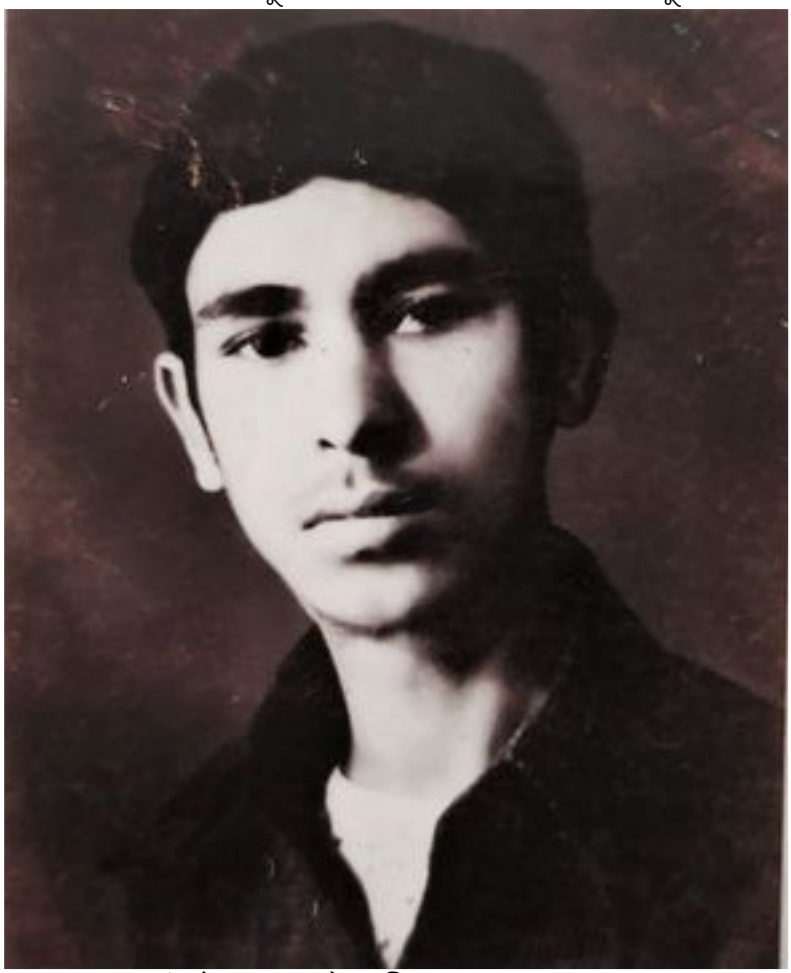

খুব যে আদরে আমাদের ছোট বেলা কেটেছে এমনটা বলা না গেলেও, একদম অনাদর হয়নি প্রথম দিকের কারুরই । তৎকালিন পারিবারিক ব্যবস্থাতে বড়রাই ছোটদেরকে দেখেশুনে রাখতাম বলে একটা সময় পর্যন্ত ছোটরাও মোটামুটি যত্নের মধ্যেই বড় হচ্ছিল।

স্বভাবে চঞ্চল মোস্তাক ছোটকালে তেমনটা না হলেও একটু বড় হতেই বেশ দুরন্ত হয়ে উঠছিল। উঠতি বয়সের ওই দুরন্তপনাকে ঠিক পথে পরিচালনা করার মত যথেষ্ট চিন্তা বা দুশ্চিন্তা ঐ সময়ে আমাদের কারুরই ছিলনা ।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে আমি তৎকালিন PIA র চাকুরী নিয়ে প্রশিক্ষন এর জন্য পাকিস্তানের করাচী চলে যাওয়ার পর নিজের ভবিষ্যৎ গঠনের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি । মাঝে মাঝে ঢাকাতে আসলেও সময়টা পারিবারিক ও সামাজিক বিনোদনেই কাটাই ।

একসময় যখন জানতে পারলাম মোস্তাক ঢাকাতে ঠিক মত লেখাপড়া করছেনা তখন ওকে ময়মনসিংহের নান্দিনা পাইলট স্কুলে বোর্ডিংএ রেখে পড়াশোনা করানোর একটা উদ্যোগ নেই ।কিন্তু ঢাকা অন্তঃপ্রাণ মোস্তাক বোর্ডিং থেকে কিছুদিন পরেই ফিরে এসে আবার ঢাকাতেই স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করে ।

১৯৬৮-৬৯ সাল...
জাতীয় ভাবে সময়টা ছিল খুবই উত্তাল। ঢাকা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের কেন্দ্র । নীচের ক্লাসের ছাত্র হয়েও মোস্তাক বেশ ভাল ভাবেই জড়িয়ে পড়েছিল বড়দের আন্দোলনে।
সাহস এবং ঝুকি মোকাবেলা করার দুর্দমনীয় ইচ্ছা ছিল মোস্তাকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ।
বেশ কয়েকবার পুলিশের গুলির মুখোমুখি হয়েও প্রাণে বেঁচে যাওয়া মোস্তাক একাধিক বার রক্ত মাখা কাপড়ে ঘরে ফিরেছে আহত সাথীদের কে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে।

১৯৭১ এ মোস্তাক যখন শাজাহানপুর রেলওয়ে স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র, শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ ।

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থাতে পরিস্থিতির মোকাবেলায় আমরা অনেকেই যখন দিশেহারা, মোস্তাক তখন ওর ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু মাদুদ ও সাদেক কে নিয়ে বলতে গেলে খালি হাতে ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়ে কুমিল্লার চান্দিনা হয়ে আগরতলার মেলাঘর ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়। সেটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের দিনগুলো , এপ্রিল-মে ১৯৭১ ।

প্রচন্ড কষ্ট এবং ক্ষুধার যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে মোস্তাকরা মে '৭১ এ ঢাকা ফিরে আসে এবং কিছু টাকা জোগাড় করে মে মাসেরই শেষ দিকে আবার মেলাঘর এ ফিরে যায় । যাওয়ার সময় আমাকে দিয়ে যায় মেলাঘর যাবার পথের নির্দেশনা।

মোস্তাকের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী আমি পরবর্তীতে মেলাঘর পৌছাতে পেরেছিলাম। যদিও অজানা – অচেনা পথে বেশ ভয়ঙ্কর এক বিপদের মুখামুখি হয়ে । এ বিষয়ে পরবরতিতে কখনও লেখা যাবে ।

দ্বিতীয়বার মেলাঘর যাবার সময় মোস্তাকের সাথী হয় আমাদের খালাত ভাই শামীম ।
ওরা দু'জন মেলাঘরে গিয়ে ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার এর তত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। প্রশিক্ষণ শেষে মোস্তাক কমান্ডার জাকির হোসেন এর Group এ যোগ দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগী বাহিনী হিসেবে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয় । শামীমকে খুব সম্ভব অন্য কোনও দলে যোগ দিতে হয়।

ইতিমধ্যে আমি মেলাঘরে পৌছে ক্যাপ্টেন হায়দার এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হই এবং কিছুদিনের মধ্যেই উদয়পুরে পালাটোনা ট্রেইনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শুরু করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমাকে দুর্ধর্ষ গেরিলা দল মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার নেতৃত্বাধীন CRACK PLATOON এর সদস্য হিসেবে ঢাকা শহরে গেরিলা কার্যক্রম চালানোর জন্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়।

এই সময় আমার পিঠাপিঠি ছোট ভাই শাহারুকও বিহার এর ওম্পি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মেলাঘর এ পৌঁছে যায় এবং আমরা একই সংগে CRACK PLATOON এর সদস্য হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি ।

যুদ্ধের ঐ সময়ে মেলাঘরে কিছুদিন একত্রে থাকলেও মোস্তাকের সঙ্গে আমার দৈনিক যোগাযোগ ছিলনা এবং সংগত কারনেই খোঁজ নেয়ার সুযোগ ছিলো না বিধায় ওদের কার্যক্রম সম্বন্ধে কখনও জানতে পারিনি ।

খুব সম্ভব ২৭/২৮ আগস্ট তারিখে ক্যাপ্টেন হায়দার আমাকে খবর পাঠান ওনার সঙ্গে দেখা করতে । দেখা হলে প্রথমেই জানতে চান আমি মোস্তাকের বিষয়ে কিছু জানি কিনা। আমার না বোধক জবাব পেয়ে উনি শুধু বললেন আমি যেন ক্যাম্পের বাইরে কোথাও যাওয়ার আগে অবশ্যই ওনাকে জানাই । ওই সময়ে বিভিন্ন কাজে আমাদের প্রায়ই দল বেঁধে ক্যাম্পের বাইরে যেতে হতো।

২৯ আগস্ট ১৯৭১ ...
ক্যাপ্টেন হায়দার আমাকে জানান যে মোস্তাক পাকিস্তানীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হয়ে আগরতলা GB HOSPITAL এ আছে এবং কিছু পরেই ক্যাম্প থেকে আগরতলা হাসপাতালে যে গাড়ী যাবে সেটাতে আমি ইচ্ছে করলে যেতে পারি।

আমার চিন্তা করার কোন অবকাশ ছিলনা । মুহূর্তেই সম্মতি জানিয়ে আমি তৈরি হয়ে নেই এবং খুবই শঙ্কিত মনে রওয়ানা দেই ।
কয়েক ঘন্টার যাত্রা শেষে যখন হাসপাতালে পৌছাই তখন প্রায় সন্ধ্যা । হাসপাতালে দর্শনার্থীদের ঢোকার সময় শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই ।

গাড়ী থেকে নেমে একজন গিয়ে হাসপাতাল এর Receiption এ কথা বলতেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে গেল।

মোস্তাকের ভাই এসেছে শুনে শুধু যে ঢোকার অনুমতি দিল তাই নয়, আমাকে খুবই সন্মানের সঙ্গে ডাক্তার দের নির্দিষ্ট কামরাতে নিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে মোস্তাকের আহত হবার পর থেকে হাসপাতালে আসার বিবরন দিয়ে আমাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে । মনে হচ্ছিল G B Hospital এর সমস্ত স্টাফ যেন আমাকে দেখে যাচ্ছিল । মোস্তাকের ভাই হিসেবে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আমি অনুভব করি ।

বয়স, দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী এবং আঘাতের ধরন বিবেচনা করে মোস্তাককে এক কিংবদন্তি উদাহরণ হিসেবে গ্রহন করে হাসপাতাল কর্তিপক্ষ এবং ওর জীবন বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্তা নিয়ে প্রায় দু'দিন যমে মানুষে লড়াই করে মৃত্যুর হাত থেকে মোস্তাককে ফিরিয়ে আনে।

ক্যাপ্টেন হায়দার আমাকে মোস্তাক সম্বন্ধে প্রথম আলাপে কিছু না বলার কারন ছিল যে ডাক্তাররা ওর জীবনের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছিলেন না । হয়ত এক সময়ে মোস্তাকের মরদেহ মেলাঘরে পাঠিয়ে দিতে হতো । আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে মোস্তাক জীবন ফিরে পায় এবং হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভালোবাসায় স্থিতিশীল অবস্থায় আসার পরই আমাকে জানানো হয় আর সেইসাথে দেখা করার সুযোগ দেয়া হয় ।

প্রথম দেখায় মোস্তাককে চেনার কোনও উপায় ছিলনা । প্রায় অচেতন মোস্তাককে প্রচুর ব্যান্ডেজ এর মধ্য দেখতেই পারছিলাম না । কথা বলার তো প্রশ্নই উঠেনা ।
আমাকে বলা হল রাতটা কোথাও কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার আসতে ।
আগরতলা শহর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত বিধায় প্রয়োজনে আমি হাসপাতালেই থাকতে পারি জানিয়ে একটা জায়গা ও দেখান হল। আমি হাসপাতালেই থেকে যাই এবং পরদিন সকালে আবার মোস্তাককে দেখতে যাই ।

ওর তখন ভাল জ্ঞান আছে এবং আমাকে চিনতে পেরে অনেক কিছু বলতে চাইছিল ।
ডাক্তার দের নিষেধে দেখাটা অনেক সংক্ষিপ্ত করতে হয় এবং আবার আসবো বলে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

মোস্তাক্ কে দেখতে দু'এক দিনের মধ্যে আবার আগরতলা যাই এবং ওই সময়ে মোস্তাক আমাকে ওর আহত হওয়ার ঘটনা সম্বন্ধে অল্প কিছু বর্ণনা করে ।

যতোটুকু জানতে পারি মোস্তাকের Commander জাকির হোসেন এর নেতৃত্বাধীন ২নং সেক্টর এর ১২নং গ্রুপটাকে কুমিল্লা জেলার সালদা নদীর তীর এলাকায় রঘুরামপুর গ্রামের কাছে সালদা নদী এবং রেল লাইন ক্রস পয়েন্ট এ সম্মুখ যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয় যেখানে পাকিস্তানী সেনারা বাঙ্কার করে অবস্থান নিয়েছিলো।

পরিকল্পনা অনুযায়ী জাকির তার দল নিয়ে নদী পার হয়ে Crawling করে গিয়ে পাকিস্তান সেনাদের বাঙ্কারে এ গ্রেনেড নিক্ষেপ করবে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নদীর ওপার থেকে Covering Fire দিয়ে ওদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে । মোস্তাক ছাড়াও ওই দলে সামসুল হুদা, জাহিদ, ইয়াদ আলি, আবু তাহের, ইসা, সবুজ, নুরুল আমিন, আদিল খান, মোহাম্মাদ ইব্রাহিম, মাদুদ ও সাদেক খান সহ আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন যাদের মধ্যে মোস্তাক ছিল সর্ব কনিষ্ঠ ।

ওই ধরনের প্রচণ্ড বিপদসংকুল একটা অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান সেনাদেরকে তাদের শক্ত অবস্থান থেকে হঠানো, যেটাতে অনেক দিনের প্রচেষ্টাতেও কোনও ভাবেই সফলতা আসছিলনা এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন।

ওখান থেকে পাকিস্তান সেনাদের সরাতে পারলে কসবা থেকে সালদা রেল স্টেশন ও নদী পথে সালদা নদী রেলক্রস পয়েন্ট থেকে মন্দবাগ বাজার পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা মুক্তিবাহিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আয়ত্তাধীনে চলে আসবে বলেই এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক আক্রমনের পরিকল্পনা করা হয় ।

পাকিস্তান বাহিনী Bunker থেকে অনবরত মেশিন গান এর গুলি বর্ষণ এবং মর্টার শেল নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল, যার কারনে অনভিজ্ঞ এই ছোট দলটাকে খুবই সাবধানতার সঙ্গে নদী পার হয়ে Crawling করে Bunker এর দিকে যেতে হচ্ছিল । মোস্তাক ছিল সবার সামনে এবং ওর পিছনেই Commander জাকির হোসেন।

হঠাৎ মর্টার শেল এর একটা Splinter মোস্তাকের গলায় আঘাত করে যার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই ডান হাতটা ওর গলার উপর চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেশিন গান এর গুলিতে হাতটা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রচন্ড ব্যাথায় মোস্তাক চিৎকার করে উঠে 'জাকির ভাই আমাকে বাঁচান, ।

মোস্তাকের চিৎকারে বিহব্বল জাকির হোসেন Crawl Position থেকে উঠে ওকে ধরতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে মেশিন গাণ এর Brush Fire এ তার দেহটা ঝাঁজরা হয়ে যায় । নিজের কষ্টের সঙ্গে যোগ হয় Commander এর তাৎক্ষণিক মৃত্যু দর্শন । এক বিশাল হৃদয়ের মুক্তিকামী তরুনের মর্মান্তিক পরিনতি।

স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আজকের ভাগ্যবান তরুনেরা স্বপ্নেও কোনোদিন বাংলার সেই সমস্ত বীর তরুন্ মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ, সাহসিকতা, সহমর্মিতা এবং কঠিন অভিজ্ঞতার কথা উপলব্ধি করতে পারবে বলে আমি কোনদিন বিশ্বাস করতে পারিনা।
ভীষণ কষ্ট হয় ভাবতে যে, আমার জীবনদ্দশায় হয়ত এমন এক প্রজন্ম দেখে যেতে পারবনা যে প্রজন্ম মা, মাটি, মায়ের ভাষা ও মানুষের জন্যে হাসি মুখে জীবন বাজী রেখে লড়তে পারে।

মুক্তিযোদ্ধা জাকির হোসেনের মৃতদেহ পরে উদ্ধার করে মুক্ত এলাকায় এনে সামরিক সন্মানের সঙ্গে দাফন করা হলেও ওই সময়ে মোস্তাককে উদ্ধার করার মত পরিস্থিতি না থাকায় মোস্তাক নিজে ডান হাতটা বুকের উপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে পিঠ সাঁতার কেটে নদীর অপর পাড়ে যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অপেক্ষা করছিলো সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে সমর্থ হয়।

সেনাবাহিনীর সদস্যরা মোস্তাককে উদ্ধার করে আগারতলা G B Hospital এ যখন নিয়ে যায় তখন আহত হওয়ার পর থেকে কয়েক ঘন্টা পার হয়ে গেলেও এর মধ্যে মোস্তাক কখনও জ্ঞ্যান হারায়নি বলে ডাক্তাররা আমাকে জানান এবং মনে করেন একবার জ্ঞ্যান হারালে মোস্তাকের জন্য ফিরে আসাটা কঠিন হতো ।
আল্লাহর রহমতে কঠিন আত্মবিশ্বাস মোস্তাককে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে ।

প্রশিক্ষণ চলার সময় ও প্রশিক্ষনের পরে বাংলাদেশে প্রবেশের আগে আমি কয়েকবার মোস্তাককে দেখতে যাই। কখনও ওকে পীড়িত মনে হয়নি, বরং ভাবতো সুস্থ হয়ে কখন আবার যুদ্ধে যোগ দিবে।
মোস্তাকের বয়সি আরও কয়েকজন আহত মুক্তিযোদ্ধা G B Hospital এ চিকিৎসাধীন ছিল যাদেরকে হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারীরা খুবই ভালবাসত ।

ভারতের সাধারন লোকেরা যারা একটা গনতান্ত্রিক সরকারের অধীনে ২৪ বছর কাটিয়েছে তারা অবাক হয়ে ভাবত কিভাবে এত কম বয়সের ছেলেরা পাকিস্তান সেনাদের মত একটা প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে সাহস করে । ওরা কোনদিন বুঝতেও পারেনি যে পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই বাঙ্গালীদের এতটা মরীয়া হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে ।

অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নানা উপহার ও পথ্য দিয়ে যেত যেগুলো ওরা অন্যান্য গরীব রোগীদেরকে দিয়ে দিত বলে রোগীদের মধ্যেও মোস্তাক্ রা খুবই প্রিয় ছিল ।

বাংলাদেশে প্রবেশের আগে আমি শেষ বারের মতো গিয়ে হাসপাতালে মোস্তাকের দেখা পাইনি । ওকে তখন উন্নত চিকিৎসার জন্য গৌহাটিতে অন্য একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল ।
মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমরা যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তখন আর মোস্তাকের খোঁজ রাখা সম্ভব ছিলনা ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ এর জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে মোস্তাককে ভারতীয় বিমান বাহিনীর Helicopter এ করে ঢাকাতে পৌঁছে দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিদেশে পাঠানোর জন্য অপেক্ষমান রাখা হয়।
সে সময়ে বিভিন্ন দেশ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবায় হাত বাড়িয়ে দেয়ায় মোস্তাকের পঙ্গু ডান হাতের সুচিকিৎসার সুযোগ তৈরি হলেও বিভিন্ন জটিলতায় সেটা আর হয়ে উঠেনি ।
যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে আমি নিজেকে নবগঠিত বাংলাদেশ বিমানের একনিষ্ঠ কর্মী রূপে নিবেদন করি এবং বিমানের উন্নতির সঙ্গে নিজের পারদর্শিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিবিষ্ট হই ।
মোস্তাককে খুব একটা সময় দিতে পারছিলাম না এবং ওর পুনর্বাসনের ব্যাপারটা ভবিষ্যতের জন্যই রেখে দেই ।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে আমার আব্বাকে পাকিস্তান সামরিক সরকার গ্রেফতার করে দুই মাসের মত বন্দী রেখে অমানুষিক নির্যাতন করে। যার পরিণতিতে স্বাধীনতার পরও বহুদিন অসুস্থ ছিলেন বিধায় মোস্তাকের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিনিও কোথাও যোগাযোগ করতে পারছিলেন না ।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও যেহেতু কোন চিকিৎসা হচ্ছিলো না, সেহেতু মোস্তাক প্রায়ই বাসায় চলে আসতো । এ জন্য হাসপাতাল কর্তিপক্ষ বা আমরা কেউই উদ্বিগ্ন ছিলাম না। বরঞ্চ মোস্তাক থাকলে ওর অনেক বন্ধু বান্ধবরা আসতো বলে আমরা খুশিই ছিলাম ।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তখন খুবই সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল যেটা আমার মতো নিশ্চিত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এর হাতছানি পাওয়া যুবকেরা খুব একটা উপলব্ধি না করতে পারলেও আপামর জনতা কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারছিলনা ।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতের হাসপাতাল গুলোতে যে সন্মান, যে সমাদর মোস্তাকরা পেয়েছে এবং বিপরীতে স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যে অবহেলা আর অনিশ্চয়তার শিকার হয়, তার পরিণতিতে চারিত্রিক ভাবে প্রতিবাদী মোস্তাক খুব শীঘ্রই সার্বিক বাবস্থাপনার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে । ভাল কোন কিছু আশা করতে ভুলে যায়। নির্মম হলেও এটাই বাস্তব সত্য ।
এই পরিস্থিতে মোস্তাকদের মত তরুন মুক্তিযোদ্ধা যারা মত্যুকে খুব কাছে থেকে দেখেছে এবং স্বাধীনতার পর বুক ভরা আশা নিয়ে জাতির দিকে তাকিয়ে ছিল তাদের হৃদয় ভাঙ্গা হতাশা কে জাতি হিসাবে বাংলাদেশ অথবা সমাজ বা পরিবার হিসেবে আমরা কেউই মূল্যায়ন করার চেষ্টা করিনি অথবা প্রয়োজন বোধ করিনি।

ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়েই দায়িত্ব পালন করেছি । অদ্ভুত মানসিকতা !

একদল টগবগে তরুন হারিয়ে যেতে থাকে সমাজ থেকে । এর দায়ভার আমাদের । পুরা জাতির ।

সেনাবাহিনীর যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রায় অসম্ভব কিছু ভয়ঙ্কর অভিযানে এই সব তরুনদের (বর্তমান সরকারি বিবেচনায় শিশু) ব্যবহার করে যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব নিয়ে পরবর্তীতে নানাভাবে পুরস্কৃত হলেন, যুদ্ধ শেষে এই সকল তরুণদের ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকেও কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি ।

মোস্তাক আজ আমাদের মাঝে নেই । মোস্তাক বেঁচে নেই । ওকে বাঁচতে দেয়া হয়নি অথবা মোস্তাকরা বাঁচার জন্য পৃথিবীতে আসেনা ।সংক্ষিপ্ত জীবনে মোস্তাকরা যতটুকু সম্ভব পৃথিবীকে শুধু দিয়ে যায় এবং কিছু লোকের ভাগ্য গড়তে সাহায্য করে জাতিকে এবং সমাজকে ঋণী রেখে নিজেরা নিঃস্ব হয়ে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষে নতুন সরকার গঠনের পরপরই বৈশ্বিক ও রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার মাঝে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের যে সংস্কৃতি বাংলাদেশে শুরু হয় যার অতি সাম্প্রতিক শিকার মেজর (অবঃ) সিনহা মোঃ রাশেদ খান, তারই বলি হয়ে অনেক তরুন মুক্তিযোদ্ধার মত মোস্তাককে ও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

১৯৭২ এ দেশে ফেরার পর থেকে ১৯৭৩ এ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা নানা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান করলেও কোনদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে মোস্তাকের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা শুনার তাগিদ অনুভব করিনি । না পারিবারিক ভাবে, না সামাজিক ভাবে । কেউ শুনতে চাইনি ওর ওই সময়ের মনের কথা । মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার বিরল অভিজ্ঞতার কথা । ভবিষ্যৎ এ সুযোগ এলে ঘটা করে শুনব ভেবে অপেক্ষায় ছিলাম । কিসের ভবিষ্যৎ? কাদের ভবিষ্যৎ??

আজ স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এসে মোস্তাকের মত বহু মুক্তিযোদ্ধা নামের আগে বীর মুক্তিযোদ্ধা কথাটা লিখারও অধিকার রাখেনা । কারন বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার প্রমান সরূপ সরকারি গেজেটে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই । ভয় থেকে যায় গেজেটে নাম না থাকায় মুক্তিযোদ্ধা দাবী করাটা আইন সম্মত হয় কিনা ! !

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় মাত্র নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে কত শত মুক্তিযদ্ধা দেশের ভিতরে ও বাহিরে প্রান বিসর্জন দিয়েছেন তার প্রকৃত হিসাব কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা জানিনা । কত মুক্তিযোদ্ধা এখনো মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন তারও হিশাব নাই ।

যে দেশে বিভিন্ন পদাধিকারী সরকারি/বেসরকারি কর্মচারী/কর্মকর্তারা হীন স্বার্থে নিজেদের অথবা প্রিয়জনদের নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় উঠিয়ে গেজেটে অন্তর্ভুক্ত করে ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করার মত মানসিকতা রাখেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দান কারি বিভিন্ন দেশের মহৎ হৃদয়ের বিশিষ্ট বাক্তিদের বাংলাদেশে ডেকে সন্মান দেখানোর নামে ভুয়া ক্রেস্ট দিয়ে অসন্মান করার মত লজ্জাকর ঘটনা ঘটে , সেদেশে মোস্তাকদের মতো প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহন কারিদের নাম সরকারি গেজেটে না থাকাটা আশ্চর্য হওয়ার মত কোন ঘটনা নয় ।

মোস্তাক সহ আমরা তিন ভাই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন করলেও আজও সরকারি গেজেটে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করাতে পারিনি নানা জটিলতায় ।
স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সাক্ষরিত Certificate এবং এক কালীন ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা অনুদান ছাড়া মোস্তাক জীবদ্দশায় সরকারের কাছ থেকে কোন সহায়তা পেয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই । অনুযোগ ও ছিলোনা ।

আল্লাহর রহমতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মত একটা মহান কার্যক্রমে অংশ নিতে পেরেছিলাম এটাই আমাদের গর্ব । সরকারি স্বীকৃতি আমাদের যতটুকু বাড়তি গর্বিত করবে আমাদের সন্তানদের তার চেয়েও বেশী গর্বিত করবে বলে এখনো চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছি সেই স্বীকৃতির জন্য । আগামী প্রজন্ম অবশ্যই আমাদের কাছে এটা প্রত্যাশা করার দাবী রাখে । আমরা আশাবাদী । ইনশাআল্লাহ সকল মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি আসবেই ।